দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 SEP 2007

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

আমাদের উচ্চশিক্ষা

আমাদের দেশে মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হওয়া যায়। উন্নত বিশ্বের কোথাও এমন সহজ ব্যবস্থা নেই। উন্নত বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা হলো পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রী এবং গবেষক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ। অর্থাৎ শিক্ষকতার প্রবেশমুখেই একটা বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তার ওপর আছে দলীয়করণ। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আজকাল মেধার-মূল্যায়ন হয় না। দলীয় আনুগত্য সেখানে প্রাধান্য পায়

শিশির কুমার ভট্টাচার্য

(শেষাংশ)

উচ্চশিক্ষার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশে দু'ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় আছে। স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। বিগত বেশ কিছুকাল থেকেই সবার অভিযোগ যে বিশ্ববিদ্যালগুলো ঠিকমতো চলছে না। লেখাপড়ার কোন পরিবেশ নেই। চলছে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। তার ওপর সেশনজট। চার বছরের কোর্স শেষ করতে লেগে যাচ্ছে প্রায় আট বছর। এহেন পরিস্থিতিতে ১৯৯৩ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় দু'টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরা বিপুল অর্থের বিনিময়ে নির্ঝঞ্ঝাট ডিগ্রী লাভের জন্য সেশনজটবিহীন এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হয়। বেসরকারী এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য যুগপৎ প্রশিক্ষণে পেশাগত শিক্ষায় পারদর্শী করা। মেধা বা মনন বিকাশের সুযোগ এখানে অনুপস্থিত। প্রাথমিক লক্ষ্য যা-ই থাকুক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন পরিণত হয়েছে এক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তার দু'পাশে যেভাবে একের পর এক সারিবদ্ধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাতে মনে হয় এগুলো যেন এক একটি দোকান। ডিগ্রী বিক্রির দোকান। প্রত্যেকটি দোকানে একাধিক ডিগ্রী কিনতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ডিগ্রীর দামও আলাদা। ঢাকা শহরে এ ধরনের অর্ধশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এগুলোকে অবশ্য 'বিশ্ববিদ্যালয়' পদবাচ্য বলা যায় না। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় 'আউটার ক্যাম্পাস' নামে ঢাকা শহরের বাইরেও এক একটি ভাড়া বাড়ি ও জনাকয়েক খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়ে এক একটি শাখা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে বসেছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুত এবং দলীয় আনুগত্যই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। তাতে ব্যবসার কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও আজ আর মানসম্মত লেখাপড়া হচ্ছে না। প্রত্যেক বিভাগে ছাত্র আছে, পর্যাপ্ত শিক্ষক আছেন; ক্লাসরুম আছে, লাইব্রেরী আছে, গবেষণাগার আছে, জীবন গড়নের সব ব্যবস্থাই আছে, অথচ লেখাপড়া হচ্ছে না। যে কোন উপবৃত্তের দুটি 'ফোকাস' থাকে। ফোকাস দু'টি যদি মিলিত হয় তাহলে উপবৃত্তটি পরিণত হয় একটি নিখুঁত বৃত্তে। বিশ্ববিদ্যালয় নামক উপবৃত্তেরও দু'টি ফোকাস : ছাত্র এবং শিক্ষক। ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিতভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় নামক শিক্ষাক্ষেত্রটিকে সার্থক করে তুলতে পারে। কিন্তু তা হচ্ছে না। এর কারণ একটি নয়, বহুবিধ। একটি কারণ হলো, ছাত্রসংখ্যার আধিক্য। আমাদের দেশে শতকরা মাত্র বিশজন লোক শিক্ষিত। অথচ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীদের অস্বাভাবিক ভিড়। দেশে বেকার সমস্যা প্রকট। সবারই ভাবনা, 'এমএ'টা পাস করলে হয়ত একটা চাকরি জুটে যেতে পারে। ডিগ্রী পাস করে তাই সবাই এসে হাজির হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য। অথচ এসব ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশেরই উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কোন যোগ্যতা নেই। তা সত্ত্বেও তাদের ভর্তি করতে হয়। তালগোল এসব ছাত্রছাত্রীকে এক কাতারে রেখে মানসম্মত শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। শিক্ষকরা তাঁদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তার ওপর আছে ছাত্র নামধারী রাজনৈতিক দলীয় মস্তান। ওরাই নিয়ন্ত্রণে রাখে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। অবস্থার চাপে 'সহজ করে পড়ান এবং সহজ প্রশ্ন করে পরীক্ষা নেয়া'র ভিত্তিতে চলতে থাকে পড়াশোনা। ফলে শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে নেমে যেতে থাকে। অন্যদিকে শিক্ষকদের যোগ্যতার বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ। আমাদের দেশে মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হওয়া যায়। উন্নত বিশ্বের কোথাও এমন সহজ ব্যবস্থা নেই। উন্নত বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা হলো পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রী এবং গবেষক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ। অর্থাৎ শিক্ষকতার প্রবেশমুখেই একটা বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তার ওপর আছে দলীয়করণ। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আজকাল মেধার মূল্যায়ন হয় না। দলীয় আনুগত্য সেখানে প্রাধান্য পায়। একবার এক উপাচার্য দম্ভ করে বলেছিলেন, 'প্রয়োজনে থার্ডক্লাস' প্রার্থী নেব। তবু শতকরা এক শ' ভাগ দলীয় হতে হবে।' এ কথার প্রমাণ [illegible] নিয়োগ পাওয়া এক [illegible] দেখা পেয়ে যে অনেকেই ডিগ্রী না করে ফেরত এসেছেন। কাজেই দেশী ও বিদেশী পিএইচডি ডিগ্রীর মধ্যে যে মানগত একটা পার্থক্য আছে তা সহজেই অনুমেয়। গবেষণার দিক থেকেও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। সম্প্রতি আমাদের দেশে কিছু কিছু গবেষণা হচ্ছে। তবে তার মধ্যে মৌলিক গবেষণা খুব একটা দেখা যায় না। সুতরাং যোগ্যতার দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমাদের স্থান অনেক নিচে। বলতে লজ্জা নেই, আমরা অনেকেই আছি যারা পাশ্চাত্যের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হওয়ার উপযুক্ত নই। অথচ এখানে আমরা এক একজন সিনিয়র প্রফেসর হিসেবে আছি বা ছিলাম।

নীতিমালার বদৌলতে শিক্ষকদের মধ্যে সবাই প্রফেসর হতে পারছেন। এখানে কেউ কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রফেসরের সংখ্যাই অধিক। এমনও বিভাগ আছে যেখানে লেকচারার প্রায় নেই বললেই চলে। প্রফেসরদের সংখ্যাধিক্য শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আরেকটি কারণ। বিধি অনুযায়ী প্রফেসর সাহেবরা কম ক্লাস নিয়ে থাকেন। কেননা একজন প্রফেসর অধিকাংশ সময় ব্যয় করবেন গবেষণাকর্মে– এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু আমাদের শিক্ষক মহোদয়রা প্রফেসর হওয়ার সুবাদে ক্লাস কম নেন ঠিকই। কিন্তু তাঁদের অনেকেরই গবেষণা করার কিছু থাকে না। ফলে জুনিয়র শিক্ষকদের ওপর চাপ পড়ে অনেক বেশি। অন্যদিকে প্রফেসর পদপ্রাপ্তির পর অনেকের আর কোন একাডেমিক প্রত্যাশা থাকে না। জীবনের বাকি সময়টা কাটে ক্ষমতাসীনদের লেজুড়বৃত্তি করে। তাতে অবশ্য কিছু প্রাপ্তিও ঘটে। সাধারণভাবে যাঁরা কখনও সহকারী অধ্যাপকের উপরে উন্নীত হতে পারতেন না, নীতিমালার বদৌলতে তাঁরা আজ প্রফেসর হয়ে ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদে কেউ উপাচার্য, উপ-উপাচার্য হচ্ছেন। কেউ হচ্ছেন ভিন, বিভিন্ন কমিশনের মেম্বার। কেউ বা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য। যাঁদের সত্যিকার শিক্ষাগত উৎকর্ষ (academic excellence) আছে তাঁরা কিন্তু থেকে যাচ্ছেন পর্দার আড়ালে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সবাই কি সব কাজের যোগ্য? কাগজেকলমে 'প্রফেসর' খেতাব পেলেই কি জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটে যায়? যিনি কোন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেননি, দেশ-বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁর কোন ধারণা নেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম পরিষদের বিশেষজ্ঞ সদস্য হয়ে কী অবদান রাখতে পারেন? আসলে সঠিক ব্যক্তি যদি সঠিক জায়গায় (right man in the right place) না থাকেন তাহলে প্রশাসনের জন্য তা সুফল বয়ে আনতে পারে না। তা শুধু ভবিষ্যতের জন্য জটিলতারই সৃষ্টি করে।

নীতিমালার চেউ প্রশাসনেও লেগেছে। দেখা যাচ্ছে, অফিসারদের নীতিমালার বলে একজন অফিস সিনিও অফিসার পদে উন্নীত হচ্ছে। তার ওপর আছে প্রশাসনিক অনিয়ম ও দলীয়করণ। দলীয়করণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিএ বা বিকম পাস ব্যক্তিকে কারিগরি বিদ্যা ও হিসাববিজ্ঞান শাখার বিশেষজ্ঞ পদে নিয়োগ দিতে তাঁরা ইতস্তত করেন না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] দেখা দিয়েছে।

[illegible] এবং [illegible] সমন্বয় [illegible]।

[illegible] আরও ৬ জন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি আছেন। তাছাড়া সিন্ডিকেটের প্রতিনিধি কিংবা বিশিষ্ট নাগরিক প্রতিনিধিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেন। সুতরাং বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা শিক্ষকদের ওপরেই ন্যস্ত। আশা করা গিয়েছিল যে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাবিদদের হাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হবে এবং উচ্চশিক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। কিন্তু তা হয়নি। আমরা প্রমাণ করেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেও আমরা লোভ-লালসা বা গোষ্ঠীস্বার্থের উর্ধে নই। ক্ষমতা হাতে পেয়েই আমরা নীতিমালা প্রণয়ন করে আমাদের পদোন্নতির পথ সহজ করে নিয়েছি। শিক্ষাক্ষেত্রে তাতে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ সংস্থা হলো একাডেমিক কাউন্সিল। একাডেমিক কাউন্সিল গঠনে নির্বাচিত প্রতিনিধির চেয়ে মেধার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রফেসর এর সদস্য। এছাড়া অন্যান্য সদস্য সংখ্যা এতই বেশি যে সপ্তাহে সকলের স্থান সঙ্কুলান হয় না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বিরাট হল ঘরে অথবা খোলা মাঠে একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং করতে হবে। এই বিপুল সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে অনেক সময়ই প্রকৃত একাডেমিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, সংখ্যাধিক্যের জোরে উপাচার্যের সহায়তায় প্রয়োজনে এ্যাক্ট উপেক্ষা করে দলীয় স্বার্থে সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে। তা সে বিভাগীয় পাঠ্যসূচী নির্ধারণই হোক অথবা দুর্নীতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই হোক।

বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আগেই বলেছি যে এ্যাক্ট '৭৩-এর বিধান অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় কয়েকটি কমিটি বা সংস্থা দ্বারা। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি, প্ল্যানিং কমিটি, কমিটি অব কোর্সেস, ফ্যাক্যাল্টি এবং একাডেমিক কাউন্সিল। অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য রয়েছে সিনেট, সিন্ডিকেট, ফাইন্যান্স কমিটি, প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি ইত্যাদি। আমরা যদি প্রত্যেক কমিটির গঠন ও ক্রিয়া নিয়ে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বত্রই এক সুচিন্তিত দর্শন কাজ করছে। এই দর্শন হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণতন্ত্রায়ন এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব। এককথায়, বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা এই এ্যাক্টের অপব্যবহার করেছি এবং কখনও কখনও প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়নে এ্যাক্টকে উপেক্ষা করেছি। দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসন যদি এ্যাক্ট বহাল থাকা অবস্থায় একজন নির্বাচিত উপাচার্যকে অপসারণ করে এ্যাক্টকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একজন দলীয় ব্যক্তিকে পূর্ণ চার বছরের জন্য উপাচার্য নিযুক্ত করে তবে তাকে প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়ন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আজ দেশে উচ্চশিক্ষার যে অবনতি ঘটেছে তার প্রকৃত কারণ এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টের অপব্যবহার। আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই তাহলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন রাজনীতিমুক্ত করা এবং ছাত্র-শিক্ষকদের ক্লাসে ফিরিয়ে আনা। এ জন্য এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে ক্ষমতার অপব্যবহারের পথ রুদ্ধ হয় এবং শিক্ষক-ছাত্ররা ক্লাসে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। আমার মনে হয় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

১। একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির সুপারিশকৃত প্যানেল থেকেই উপাচার্য নিয়োগ করা হবে। তবে কোন শিক্ষক নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারবেন না।

২। শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোন অভিযোগ ওঠে তাহলে জাতীয় কমিটির ক্ষমতা থাকবে সে বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার।

৩। পদোন্নতির নীতিমালা বন্ধ করতে হবে। উচ্চতর পদে নিয়োগের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হবে মেধা এবং যোগ্যতা। বিশেষ [illegible] প্রফেসর নিয়োগের ক্ষেত্রে কঠোর আইন আরোপ করতে [illegible] আন্তর্জাতিকমানের স্বীকৃতি না থাকলে তিনি [illegible] পারেন না।

[illegible] সফলতার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। [illegible] তিনি যাতে উচ্চতর বেতন [illegible] হবে।

[illegible] হবে। অন্যান্য সদস্য [illegible] সভাপতি [illegible]

[illegible]

সংশ্লিষ্ট [illegible] ডিগ্রী থাকে ডিগ্রী/সে-সংক্রান্ত সকল শংসাপত্র পরীক্ষা করিয়া, [illegible] সংরক্ষণ করিয়া নথিভুক্ত করিতে হইবে।

নিয়মানুসারে [illegible] সেবেতর নিকাশ করিয়া [illegible] নথিভুক্ত করিতে হইবে।

[illegible] নথি রক্ষিত থাকিলে [illegible] নথি [illegible] হইবে।

[illegible] (সংশ্লিষ্ট [illegible]) প্রকৃত [illegible] এবং উক্ত [illegible] নথি/[illegible]/সেবাবহির নকল কর্তৃক প্রদত্ত সনদের সরবরাহ করিতে হইবে।

[illegible] নথি রক্ষিত হইবে।

[illegible]/সরকারকর্মচারীকে [illegible] পদে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল [illegible]।

[illegible] নথি রক্ষিত হইবে।

[illegible] সকল শংসাপত্র [illegible] করিয়া [illegible] হইবে।

[illegible] সেবা [illegible]।

[illegible] এবং [illegible]।

কেবল [illegible]

(স্বাক্ষর)

[illegible]

PAN1-53/07-08

SC-1407/07 (15"×3)

25. a) The Procuring entity shall be sell/close circumstances or subsequent work[illegible]

b) The provisions [illegible] be in strict compli[illegible]

c) The issuance of N[illegible]

d) The quantity of wo[illegible]

e) If the bid docume[illegible]

the approval of the [illegible]